স্বরূপের বিবর্তনঃ অসাম্প্রদায়িকত া থেকেধর্মীয় জাতীয়তা

গোলাম মুশরিদ

১৯৫৮ সালে নতুন ধরণের একটি অক্সফোর্ড রেফারেন্সডিকশনারির সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশের কী পরিচয়দেওয়া আছে, তা জানার কৌতুহল হয়েছিল। খুলে দেখি, প্রথমেই বাংলাদেশেরপরিচয় দেওয়া আছে- এটা একট া মুসলিম রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি তার আগেই মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউররহমানের দৌলতে খন্ডিত হয়েছিল। কিন্তু তবু বাংলাদেশ তখনো সরকারীভাবে মুসলিম রাষ্ট্রহয়নি। তাই আমার দেশের এই পরিচয় দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম। মুসলমান -প্রধান দেশ বললে আমার হতাশারকারণ হতো না। ভাবলাম, এ হয়তো এইঅভিধানের সম্পাদকদের নিজস্ব বিচার। দেখা যাক, ভারতের পরিচয় কী লেখাআছে? দেখলাম, না, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র নয়। সিংহল বৌদ্ধ রাষ্ট্র নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যেরবিষয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানও মুসলিম রাষ্ট্র নয়।গোটা উপমহাদেশের মধ্যে এক মাত্র বাংলাদেশেরই পরিচয় ধর্ম দিয়ে। তার মানে এই যে, শেখ মুজিবেরমৃত্যুর পরথেকে বাংলাদেশের সরক ারগুলো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেব্যবহার করার জন্য ইসলামী জিগির শু করেছিল (সরকারী কর্তারাব্যক্তিগত জীবনে যতই অন-ইসলামী হোন না কেন), তা এক দশকের আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটিভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ। স্ব াধীনতাযুদ্ধশেষ হবার এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের যে- সংবিধান রচিত হয়, তাতেওবাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও ততদিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলযে, বাংলাদেশ সরকারীভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হলেও এই দেশেরজনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই যেহেতু মুসলমান, সুতরাং এটিপ্রধানত একটা মুসলিম দেশ। প্রতিদিনের সরকারী ক্রিয়াকর্মে,সরকারী মাধ্যমে সর্বত্রই ততদিনে মুসলমানী জীবনধারার প্রতিফলনঘটছিল সন্দেহাতীতভাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোনির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানী জীবনধারার এই প্রতিফলন দেখে তারা তখনকতটা হতাশ হয়েছিল, সঠিক জানা নেই। তবে, ধ ারণা করি , আংশিকভাবেহতাশ হলেও , এটাকে এই সম্প্রদায়গুলো একেবারে অপ্রত্যাশিত বলে মনে করেনি। সুতর াংসংবিধানেধর্মনিরপেক্ষতা র বিধান থাকলেও , সেই সংবিধানেরপ্রণেতারা এবং দেশের জনগণ ভালো করেই জানতেন যে, সংবিধানে যে-ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে, সেটা তত্ত্বগতভাবেই স্বীকৃতহয়েছে। এমন কি, তত দিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এইধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মতো অতটাধর্মনিরপেক্ষ নয় - অর্থাৎ কোনো ধর্মীয় ত্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা করাহবে না, বাংলাদেশ তা মানবে না। বস্তুতঃ বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবততদিনে ঈদ, ঈদে মিলাদ-উন নবী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ইসলামীউৎসবই তাঁর এবং রাষ্ট্রপতিরসরকারী ব াসভবনে সরকারী খরচে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কি,বাংলাদেশের ফৌজি বাহিনীর ক্যাডেটরা ততদিনে ত াদের শিক্ষা সমাপনকরছিলেন যে-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বললেও বাড়িয়ে বলাহয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও , কোনো কোনো ব্যাপারে দেশের উদার বুদ্ধিজীবীএবং সংস্কৃতমনা মানুষরা তাঁদের দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ হিসেবেপরিচয় দিতেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের বাঙালি পরিচয়, তাঁদের ধর্মীয়পরিচয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবেশ এবংআর্ন্তজাতিক কুটনীতি এর অনুকুল ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশঅচিরেই ত াই যাত্রা শু করেছিল যেখান থেকে তিন দশক আগে তার আগেরপ্রজন্ম তাদের যাত্রা আরম্ভ করেছিল । চল্লিশের দশকে ব

াঙালিমুসলমানরা তাঁদের বাঙালিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কেই বড়করে তুলেছিলেন এবং দেড় হাজার ম াইল দূরের একটি ভিন্ন ভাষী জাতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু দুদশক যেতে না যেতে, তাঁরা আবার ধর্মের বদলে তাঁদের ভাষিক পরিচয়কে বড় করে স্বতন্ত্র দেশ গড়েছিলেন, যে- দেশে অন্য সম্প্রদায়কেও তাঁরা তাঁদের জা তির অভিন্ন অংশ হিসেবে আলিঙ্গনকরেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে যতটা সময় লেগেছিল,বাংলাদেশ থেকে ফের পাক - বাংলা হতে সময় লেগেছিল তার চেয়ে ঢের কম।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের উজানপথে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিশ্লেষন করব দু ভাগে। প্রথম ভাগে দেখাযাবে, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং আর্ন্তজাতিক কারণ কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিদ্ধে কাজ করেছিল ।আর দ্বিতীয় ভাগে দেখা যাবে, র াষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার ধর্মীয় মদ সাধারণ মানুষেরজাতীয়তা বাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে ঘোলাটে করেছিল।

২

বাংলাদেশস্বাধীন হবার মাত্র বছর কয়েক পরে শামসুর রহমান তাঁর স্বদেশকে অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে অজানা দেশে যাত্র া করতেদেখেছিলেন। এতে তাঁর মনে যে শোক জেগে উঠেছিল , তাই থেকে ওর নামে তাঁর একটি বিখ্যাতশ্লোকের জন্ম । তাঁর এই শ্লোকেরপটভুমি আমার একেবারে অজানা ছিলনা, তবু ঘোড়ার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম। সেজন্যে তঁ াকে ১৯৮৬ সালে জিগ্যেসকরেছিলাম এরপটভুমি সম্বন্ধে। তখন জানতে পেলাম, স্বদেশকে উটের পিঠে দেখার যে-কথাটি তিনি বলেছিলেন , সেটা পুরোপুরি প্রতীকী ছিল না।বাস্তবেও ও ধরণের একটা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।একদিন তঁ ার ডি আই টিরঅ্যভেনিউর অফিসে বসে আছেন, এমনসময়ে দেখলেন, রাজধানীর সেই প্রশস্ত এবং অভিজাত রাজপথ দিয়েসত্যি সত্যি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।এসব পবিত্র উট আমদানি করা হয়েছিল পবিত্র পাকিস্তান থেকে পবিত্র কোরবা নি উপলক্ষ্যে। কারণ পূর্বপুষেরা এত শতাব্দী ধরে আল্লাহার নামে গো-ছাগল উৎসর্গ করলেও , মুজিব -পরবর্তিকালে বাংলাদেশে গো-ছাগলকোরবানি দিয়ে মনের খায়েশ যেন ঠিক পূরণ হচ্ছিল না। তাই একেবারেখোদার (মাপ করবেন, আল্লাহর) দেশের পবিত্র জন্তু এনে মনেরঅভিলাষ পূরণের চেষ্টা করেছিলেন দু-ধরণের লোকেরা। বাংলাদেশেরজন্মের ফলে একচেটিয়া ব্যবসাআর ইন্ডেটিং করে যাঁরা নব্যধনীহয়েছিলেন তাঁরা, আর ধর্ম প্রচার বা চাকরি সূত্রে মধ্যপ্র াচ্যেরপেট্রো ডলারের আর্শীবাদ পেয়েছিলেন যাঁরা সেই ভাগ্যবানরা।

খেঁজুর খেলে সওয়াব হবে অথবা উটকোরবানি দিলে ইসলামী জোশ মজবুত হবে-- এই মানসিকতা বাঙালি মুসলমানদের মনেএকেবারে নতুন, তা অবশ্য বলা যায় না। ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত একটিগল্পে শওকত ওসমান এ রকমের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে এইমানসিকতার পরিচয় মেলে। চালের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে এমন একজন লোক তার কুকর্মসপক্ষে এই যুক্তি দেখিয়েছেন ঃ চালের মধ্যে কাঁকর মেশানো আছে ঠিকই ,তবে সে কাঁকর একেব ারে খোদ আরব দেশ থেকে আনা। তার মানে, সে চালবিক্রিতেও পুণ্য, আর খেলে তো কথাই নেই। ১৯৪০ -এর দশকের এই মানসিকতারএকটা ব্যাখ্যা আমি মনে মনে খাড়া করতে পারি। তখন অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক এবং সামা জিক -সব দিকদিয়েই বাঙালি মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন। তাঁদের সেই পিছিয়ে থাকা অবস্থানটা কোথায় সেটা তাঁরা পড়শি হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করে দিনের আলোর মতপরিষ্কার দেখতেও পাচ্ছিলেন। তখন জমিদারের প্রায় সবাই হিন্দু ,উচচশ্রেনীর চাকরিবাকরির তো কথাই নেই , সাধারণ চাকরিবাকরিরমঝেও খুব কমই মুসলমানদের। ১৯৪৪ সালে সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার,উড়িষ্যা-এই বিরাট ভুভাগ থেকে এম এ, বি এ নয়, ম্যাট্রিকপরীক্ষাদিয়েছেন মাত্র হাজার চ ারেক মুসলমান। সুতরাং তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকতেপারে, তাঁরা এককাট্টা হতে পারেন দেড় হাজার মাইলের দূরের মুসলমানদেরসঙ্গে। পূর্বপুষরা আরব-ইরাণ থেকে এসেছেন , আর নিজের মাতৃভাষা পাকজবান উর্দূ নিজেদের এই স্বর ূপের কথা ভেবে গর্ব বোধ করতে পারেন,সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু একবার পাকিস্তানী নৌকায় চড়েভরাডুবি হবার পর আবার মাগরেবী হবার মানসিকতা আসে কোথা থেকে, সেটা বোঝা মুশকিল। বস্তুত, যে - দেশ জন্ম নিল ধর্মনিরপেক্ষ জ াতীয়তাবাদেরনিশান উড়িয়ে এবং জন্মের পরেই যে তার সংবিধানের অন্যতম মূলনীতিহিসেবে গ্রহণ করল ধর্মনিরপেক্ষত ার আদর্শকে, সেই দেশ কীভাবেক'বছরের মধ্যেই মৌলবাদের খর স্রোতে ভেসে যেতে আরম্ভ করল, সেটাপ্রায় রহস্যের ব্য াপার।

কয়েকটা কারণ অবশ্য সহজেই চোখেপড়ে। ৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ভারত কৃপা করে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্র

য়এবংখাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল- বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক এটা দ্রুত ভুলেগিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য একটা কথা মনের মধ্যে তাঁরা পাকাপাকি জায়গাদিয়েছিলেনঃ ভারত ডিসেম্বরের যুদ্ধেবাংলাদেশকে জিতিয়ে দিয়েছিল আপন স্বার্থে , বাঙালিদের প্রতিআন্তরিক কোনো প্রেমে নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করলেও,হিন্দুদের মধ্যে নেড়েদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ আর মুসলমানদেরমধ্যে মাল াউনদের প্রতি নির্ভেজাল ঘৃণা বিদ্যমান ছিল চিরদিনই। কেবল দেশবিভাগের পর অনুকূল পরিবেশে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছিল।তখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝেমধ্যে মুসলমানরা হিন্দুদের বা হিন্দুরামুসলমানদের রক্ত পাত ঘটাননি, তা নয়; তবে প্রাত্যহিক জীবনেপারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমে গিয়েছিল খুবই , বিশেষ করে পূর্ববাংলায় । বরং প্রতিযোগিতা এবং শোষনের উৎস হয়েছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানী মুসলমানরা। এই অনুকুল পরিবেশে, ১৯৬০ -এর দশকের শেষদিকে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিতেহয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় , সা ম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মালাউনের আতিথ্য নিতে মুসলমানদের আপত্তি হয়নি। বাঙালিয়ানারযে-জোয়ার এসেছিল, সে পরিবেশে নেড়েদের সাহায্য দিতেও হিন্দুদেরমনে দ্বিধা দেখা দেয়নি। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িকতার সর্বধবংসী লাভা স্রোতঅন্তরের মধ্যে সঞ্চিত ছিল সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো। যুদ্ধের পর সেইঘৃণা এবং অবিশ্বাসই আবার দঁ াত মেলে দেখা দিয়েছিল।

বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রথমআশঙ্কা হলঃ ভারতীয় সৈন্যরা শিগগির অথবা আদৌ তাঁদের দেশ ছেড়ে য াবেকিনা। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন ঃ শেষ পর্যন্ত এই সৈন্যরাবাংলাদেশেই থেকে যাবে। কিন্তু ৭২-এর মার্চে ভ ারতীয় সৈন্যরা যখন চলে গেল,তখন ঝড় সামলানোর বিষয় হলঃ আমাদের কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র(অর্থাৎ পাকিস্ত ানী সৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র) ওরালুট করে নিয়ে গেছে। ভারতের ফৌজি বাহিনী পাকিস্তানী দখলদারবাহিনী, যদিও সাময়িকভাবে ।এমতবস্থায় , তারা দেশ স্বাধীন করে দেবারপর তাদেরই বিদ্ধে (বাংলাদেশের তিন দিকে তো তার াই)সম্ভাব্যলড়াইতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেআমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গেলে, আমাদের জন্যে বেশভালোই হত। তবে, সেটা কোন বুদ্ধিমান লোক কেন করবে, আমার কম বুদ্ধিদিয়ে আমি তা বুঝতে পারছিনে।

সে যা-ই হোক , সৈন্যপ্রত্যাহার নিয়ে যখন সাম্প্রদায়িক জিগিরটা জোরদার করা গেল না অথবা হলনা, তখন দেখা দিলতার চেয়েও গুতর পরিস্থিতি। যুদ্ধ বিধবস্তবাংলাদেশের উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা উভয়েই বোধগম্য কারণে ভেঙেপড়েছিল।অভিজ্ঞতাবিহীন লোকদের হাতেদেশ এবং শিল্প পরিচালনার ভার পড়ায় এই সমস্যা আরও গুতরহয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং অসাধারণ ক্যারিসম্যাটিক নেতাহলেও, শেখ সাহেব দক্ষ সংগঠক অথবা প্রশাসক ছিলেন না। তাঁরঅনুরাগীদের পক্ষেও সে কথা বলা মুশকিল। তদুপরি, বোঝার ওপর শাকেরআঁটির মত সমস্য াকে জটিলতর করেছিল আওয়ামী লীগের স্বজনপ্রীতি এবংদুর্নীতি।বাংলাদেশের কোনো নেতা গণতন্ত্রের জন্যে শেখ স াহেবের মতো জেল খাটেননি। কিন্তু তিনি যখন সর্বোচ্চক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন খুব গণতান্ত্রিক নেতার মতো অ াচরণকরেননি। বস্তুত, তাঁর আধা-সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় আওয়ামীলীগের স্বজনপ্রীতি , চোরাকারবার , দুর্নীতি এবং ফ্যাসিবাদ নতুনবৃষ্টির পর আগাছা যেমন হু হু করে বেড়ে ওঠে , তেমনি রাতারাতি বেড়ে উঠেছিল। আওয় ামী লীগের নেতা,পাতি-নেতা এবং যুবনেতারা এক -এক জন এ সময়ে যে-আচরণ করেছিল,কোনো গোস্টাপো তাকে হ ার মানাতেপারে না।

যুদ্ধের ফলে আর একটা মস্তবড় ক্ষতি হয়েছিল আমদানি-রপ্তানির। দু'দেশের মধ্যে এই ব্যবস্থাএকটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সময় লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরমধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বস্তুত বহু বছরের ব্যাপক আলাপআলোচনার দরকার। ওদিকে ন'মাসের যুদ্ধের সময়ে দেশ থেকে ভোগ্যপণ্যধীরে ধীরে বলতে গেলে নিঃশেষিতহয়েছিল। যুদ্ধের পরেই টুথ পেস্ট আর কাপড়-কাচা সাবান থেকে আরম্ভকরে কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশই বাজারথেকে উধাও হয়েছিল। হন্যে হয়ে খুঁজে ক্রেতারা তাঁদের পুরোনো ব্র্যান্ডগুলো বাজারে পাচ্ছিলেন না। পেলেন বাড়ির পাশেরভারতথেকে আনা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিছুমালামাল। এগুলোর কিছু এসেছিল সরকারী পথে, কিন্তু বেশীর ভাগই এসেছিলচোরাকারবারিদের চোরাই পথে। ভারতের এইসব মালামাল গুণগত দিকদিয়ে ছিল পশ্চিমী, জাপানী, অথবা চীনা পণ্যেরতুলনায় নিম্ন শ্রেণীর । তাছাড়া, প্রথমে দামে শস্তা

হলেও, পরে এগুলোও মহার্ঘ বলে বিবেচিতহয়। তবে তা স্বত্ত্বেও , বাংলাদেশেরবাজার ভারতীয় এইসব পণ্যেই প্লা বিতহয়। কথায় বলে যারে দেখিতে নারি, তার চলন বাঁকা। এমনিতেই হিন্দু তথাভারত বিদ্বেষ ছিল আমাদের মজ্জাগত । তার ওপরে ভারতীয় পণ্যের এইপ্লাবন আমাদের মনে হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষেরও প্লাবন নিয়েএসেছিল।এই পরিবেশেই অনেকে বলতে শুকরেন ঃ এর চেয়ে পাকিস্তানের আমলেই ভালো ছিলাম।

অনেকের মনে আবার কাজ করছিলআর একটি বিশাল জুজু -ভারত হয়তো আমাদের দেশটাকে দখল করে নেবে। অথবাআমাদের স্বাধীনতা হবে নামে মাত্র,-কার্যতএবং আসলে আমরা থাকব ভারতের একটি রাজ্যের মতো। অনেকের বিশ্বাস ছিলএর চেয়েও সরল। তাঁরা আশঙ্কা করতে আরম্ভ করলেন , দেশ বিভাগেরপর থেকে হিন্দুদের যত জমিজমা তাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, অথবা নিলামে কিনেছেন,এবার বোধ হয় , সাবেক মালিকরা ভারত থেকে এসে সেসব দখল করেনেবেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনামনে পড়ছে। যুদ্ধের পর জেনারেল জয়ন্তচৌধুরী এসেছিলেন তাঁর বাল্যক ালেরশহর ঢাকায় বেড়াতে। গোপনে একদিন রিকশায়করে তিনি বেড়াতে বেরহয়েছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরীরসঙ্গে। ইত্তেফাক অফিসের সামনে এসে তিনি তাঁদের পুরোনো বাড়িটাচিনতে পেরে আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করেন। সেখবর যখন ইত্তেফাক -এর মালিকদের কাছে পৌঁছেগেল তখন পরের দিনই তাঁরা সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেনঃ কীভাবে হিন্দুরাদলে দলে তাঁদের পুরোনো সম্পত্তি দখল করতে আসছেন সে সম্পর্কে। আমার একশিক্ষক এবং নিকট-অ াত্মীয় আর পাঁচজন নব্য মুসলমান মধ্যবিত্তের মতোদেশত্যাগী হিন্দুদের জমি নিলামে এবং বেনামীতে কিনেছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনিধীরে ধীরে বেশ সাম্প্রদায়িক হয়েপড়লেন। আজীবন তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য বার অসাম্প্রদায়িকতার কথা শুনেছি। এবংযেকোনো দাঙ্গা দেখা দিলে তিনি হিন্দুদের আশ্রয় দিতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে,পাছে তাঁর জমিজমা হাতছাড়া হয় এই আশঙ্কা তাঁকে কেবল ভারতবিরোধীই নয়, এমনকি , হিন্দু বিরোধী করেতোলে। ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনলে এ সময়ে তিনি অকৃত্রিম বিজাতীয় ঘৃণাপ্রকাশ করতেন। আবার মুখুজ্জে, বাড়ুজ্জের া দেশে এসে চাকরিবাকরিতে ভাগ বসাবে, এমন আশঙ্কাওতাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। তখন বাংলাদেশের নিরাপত্তা বা হিনীতে এক জনউচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন জেনারেল দত্ত। তিনি পাকিস্থানি নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অনেকের মতোআমার এই আত্মীয় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন যে, ইনি হয়তো ভ ারতীয় সেনাবাহিনীর থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত হয়েছেন। আসলে ভারতভীতি এবংভারতের প্রতি অবিশ্বাস এ সময়ে কার্যক ারণে কী যে ঘনীভুত হয়েছিল,সেটা বলে বোঝানো যাবে না। এই ভারতভীতি এবং ভারতের প্রতি অবিশ্বাসের চেতনা যে নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং বহু শতাব্দীর বিদ্বেষ থেকে জন্মনিয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এমনকি,ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ যে -মৈত্রী চুক্তি করেছিল, সেটাকেও মৈত্রীরপ্রতীক মনে না করে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ভ ারতেরকাছে দাসখত দেওয়ার সমান বলে গণ্য করেছিল।

আমার ধারণা , যুদ্ধ পরবর্তীবাংলাদেশে মুসলমানদের মনে কেবল সাম্প্রদায়িক চেতনাই দানা বাঁধেনি , সেই সঙ্গেনিজেদের স্বরূপ সর্ম্পকেই বোধ হয় একটা সংকট দেখা দিচ্ছিল। মনে আছে, ১৯৭৩সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে মহরমের পালন করতে আরম্ভকরলেন স্থানীয় লোকেরা। অথচ তার আগে অত বছর কোনো মহরম উৎসবএই এলাকায় দেখিনি। পরবর্তী ক'বছর এই উৎসবের মাত্রা আস্তেআস্তে বাড়তে থাকল। এই মুসলমানরা সবাই সুন্নি। এবং মহরম কোনো ধর্মীয়উৎসবও নয়। তা স্বত্ত্বেও , এই যে নতুন করে মহরম পালনের সিদ্ধান্ত এঁরানিলেন , তা তঁ াদের নিজেদের স্বরূপ জাহির করার মানসিকতা এবং তাঁদের মধ্যে এক নয়া সাম্প্রদায়িকতারউন্মেষই প্রমাণ করে। তাঁরা যে মুসলমান - এই পরিচয়টাকেই তাঁরা যেন কানে তালালাগানোঢাকের শব্দ দিয়ে জাহির করতে চাইছিলেন। এখানে র াজশাহীর একটিছোট ঘটনার উল্লেখ করলেও, এধরণের অংসখ্য ঘটনাই ঘটতে আরম্ভ করেছিলদেশের সর্বত্র।

দেশ যে উজান স্রোতে উল্টোমুখে যেতে শু করেছে, সেটা বোঝার জন্যে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধেরপরে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই আমরালক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে দূরে সরেয াচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে রাজশাহীতে আমরা যে -বন্ধুরা যুদ্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বিদ্যাসাগর সার্ধ - শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলাম, তাঁরাসবাই মিলে একটা কিছু করার কথা চিন্তাভাবনা করতে শু করল াম।শেষ পর্যন্ত সাহিত্যসংসদের সম্পাদক হিসেবে আমি ১৯৭২ সালের আগষ্টমাসে তিন দিনের জন্যে একটি সেমিনারের

আয়োজন করেছিলাম। তার মানে অতোআগেই আমরা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অবক্ষয় লক্ষ করেশঙ্কিত এবং হত াশ হয়েছিলান। এই সেমিনারের প্রবন্ধএবংআলোচনাগুলো দু'বছর পরে আলি আনোয়ারের সম্পাদনায়ধর্মনিরপেক্ষতা নামে প্রকাশিত হয় বাংলা অ্যাকাডেমির আনুকূল্যে। বস্তুত, সেই বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিশেবে কাজ করতে পারে। কেউ আগ্রহী হলে এ-বইয়ের লেখা থেকেইবুঝতে পারবেন, তখন কী কী কারণে নতুন করে হিন্দু তথা ভারত বিরোধীমনোভাব দানা বাঁধছিল এবং এই মনোভাব কোন কোন চেহারায় প্রকাশপাচ্ছিল।

দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা,চোরাকারবার, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতেরপ্রভাব খাটানে ার প্রয়াস , ভারত এবং হিন্দুদের প্রতিবাংলাদেশের মুসলমানদের অবিশ্বাস এবং ঘৃণা - এসব স্বদেশী কারণ ছাড়াও , সা ম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পবাংলাদেশের পরিবেশকে দূষিত করার আর একটি মস্ত বড় উপকরণএসেছিল বাইরে থেকে। এই উপকরণের উৎস মধ্যপ্রাচ্য। ১৯৭৩ সালেরঅক্টোবর মাসে ইসরায়েলের কাছে দাণ মার খাবার পর, পেট্রোলিয়াম উৎপ াদনকারী আরব দেশগুলো পেট্রোলকেচাইল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করতে। যুদ্ধের সময়ে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলকে মদত দিয়েছিল বলেআরব দেশগুলো এই রাজনৈতিক হাতিয়ার দিয়ে তার প্রতিশে াধ নিতে চেয়েছিল। ওপেকতাই নতুন স্ট্র্যাটেজি নিল পেট্রোলের উৎপাদন কমিয়েপেট্রোলের দাম বেঁধে দেবার। বস্তুত , অক্টোবর মাসেই শতকরা ৭৫ভাগ , ডিসেম্বরে আরও ১৩০ ভাগ। তারপর দফায় দফায় সেটা বাড়তে বাড়তেসাত বছরের মধ্যে ৩ ড লারের একব্যারেল পেট্রোলের দাম দাঁড়াল ৩০ ডলারে। তখনও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রেগানে ামিক্সের কল্যাণে দেউলে হয়ে যায়নি। তা সত্ত্বেও, পেট্রোলের এই দাম দেখে সেই সর্বশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রওদাণ বেকায়দায় পড়েছিল। বাংলাদেশের তো কথাই নেই। পেট্রলের দাম এতবেড়ে যাওয়া স্বত্ত্বেও তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা যেমনই হোক নাকেন, এত দিনের সাহায্যনির্ভর আরবদেশগুলো এক নিমেষে আঙুল ফুলেকলা গাছহবার মতো রাতারাতি ধনী দেশে পরিণত হল। এবং এইরূপান্তরের পর প্রথমেই এই দেশগুলো নিজের নিজের দেশেপ্রচুর অর্থ ব্যয় করে অনেক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিল।প্রতিরক্ষা জোরদার করল, তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিশেবেইতারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার কাজ শু করল। এক ধরণেরসীমিত মাত্রার নয়া সাম্রাজ্যবাদ আর কী!তবে এই প্রভাব বিস্তার করার জন্য পাশ্চাত্যখুব উর্বর জায়গায় ছিল না। সেটা করা গেল তৃতীয়বিশ্বের দেশে দেশে। লটারিতে টাকা জিতে দ্বিতীয়া স্ত্রী অ ানতে গেলে গরীবেরসুন্দরী মেয়েই সবচেয়ে সুবিধাজনক পাত্রী।

আরব দেশগুলোর সাংস্কৃতিকসাম্রাজ্যবাদের অবশ্য একটা সীমাবদ্ধতা ছিল- গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধদিয়ে প্রভাব বিস্তার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, -এসবেরঅনেক ব্যবহার পশ্চিমা দেশগুলো আগেই করে ফেলেছিল। সেজন্য সৌদী আরব,ইরান, লিবিয়া, এমনকী সীমিত মাত্রায় ইরাকও , মিশরসহ আফ্রিকার কোনোকোনো দেশ থেকে আরম্ভ করল। এই পণ্যের অনেক উৎপাদন বহু শতাব্দি আগেইএসব দেশে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এখন কেবল নতুন প্যাকিং-এ নতুন চেহারায় মৌলবাদ রপ্তানীর দরকার হল। এর জন্য খরচও লাগল প্যাকিং করার মতো স ামান্যই। ধর্ম প্রচারেরনাম করে, মসজিদ- মাদ্রাসা নির্মাণের নাম করে, মোট কথা পরকালের নাম করেএই আরব দেশগুলো পেট্রোল থেকে পাওয়া উইন্ডফলের সামান্য এক অংশ এসব দেশে ব্যয় করতে আরম্ভ করল।প্রসঙ্গত উল্লেখযে াগ্য , বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারীবিভিন্ন মানের যেসব মাদ্রাসা আছে, তাদের সংখ্যা অন্তত কুড়ি হাজ ার।সম্ভবত, তার চেয়েও বেশি। অথচ এখন থেকে পনেরো বছর আগেও বাংলাদেশেমাদ্রাসার সংখ্যা ছিল দু'হাজারেরও কম। আশ্চর্যের বিষয় , এই পনেরোবছরে মাদ্রাসার সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেলেও উচচ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বলতে গেলে আদৌ বাড়েনি। এসব মাদ্রাসার সংগঠন এবং পরিচালনার অবশ্য সরকারীঅনুদানও একটা বড় ভুমিকা পালন করে। কিন্তু তবু মাদ্রাসা আর মসজিদের প্রধান মূলধন আসে মধ্যপ্রাচ্যথেকেই। মধ্যপ্রাচ্যের দালাল হিশেবে যাঁরা ইসলাম প্রচ ারের ভারনিয়েছেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন কী পরিমাণ টাকাপয়সা এসেছেবাংলাদেশে। কিন্তু টাকার পরিমাণ যা- ই হোক , বাংলাদেশের মাটি অত্যন্তউর্বর বলে দেখতে না- দেখতে মৌলবাদেরনতুন চারা, কচি পাতা, এমন কী ফুল এবং ফল দিগন্ত পর্যন্তঅনেকটা এলাকা দখল করে ফেলেছে। এবং নিত্য নতুন এক-একটা রাজনৈতিক এবং/ অথবা সামা জিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ফসলেরপ্রসার ঘটেছে জ্যামিতিক হারে। যাঁদের বয়স বেশি হয়েছে ,পরকালের চিন্তা যঁ াদেরপেয়ে বসেছে, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তুকুড়ি/পঁচিশ বছরের তরুণরা এখন যেভাবে তবলিগের নেশায় বুঁদ

হন, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাকালো বোরকায় নিজেদের ঢে কে রাখেন, তা থেকেই আমাদের সংস্কৃতিরওপর আরব প্রভাবের মাত্রা অনুমান করা সম্ভব।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামীলীগের আনুকুল্যেই সাম্প্রদায়িকতা লালিত হতে আরম্ভ করেছিল, ঠিকই । তবুমুজিব সরকার প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে খুব একটাসরে যেতে দেননি। বরং যুদ্ধের পরে জামাতে ইসলামীসহ ইসলাম-পছন্দ দলগুলোকেসরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, নিষিদ্ধ ঘোষণ াকরার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে,জামাতা - সহ সবগুলো সাম্প্রদায়িকদলই ১৯৭২ স াল থেকে তলে তলে তাদের কাজকর্ম আরাকরে। হতে পারে তারজন্য তখন তাদের একটা মুখোশ পরতে হয়েছিল এবং সরাসরি বক্তব্য রাখার জন্যএকটি ভাড়া- করা প্লাটফর্মের দরকার হয়েছিল। কিন্তু সেইপ্লাটফর্মের জোগাড় করা তাদের পক্ষে আদৌ শক্ত হয়নি। তথাকথিত "প্রগতিশীল"বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোই এ সময়ে সরকারের বিদ্ধে নিজেদেরকন্ধে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জামাত এবং অন্য সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ধবজা বহন করেছে। এবং পর আশ্চের্যের বিশয়,শেখ মুজিবের পতনের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকারকরেনি কেবল কট্টর বাম আর গোঁড়া ডানপন্থী দলগুলো। হাজার হাজারমাইল দূরে অবস্থিত তাদের মদত-দাতারা চীন এবং সৌদী আরবের ইঙ্গিতেইএটা করেছে কিনা আমার তা জানানেই। কিন্তু ১৯৭০ -এর দশকের শেষ দিকেই ইসলামী মৌলবাদ বাংলাদেশে এত শক্তএবং মোটা শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, মধ্যপন্থী দলগুলোকেও আপোশ করেকমবেশি ধর্মের গীত গাইতে হয়। মনে আছে, মোটামুটি এ সময়েইমস্কোপন্থী মোজাফর ন্যাপও গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে"ধর্ম, কর্মও সমাজতন্ত্র"-এর স্লোগান তুলেছিল।

সেখ মুজিব এবং আওয়ামী লিগেরপতনের পর সাম্প্রদায়িতার উত্থান আরম্ভহয় সরাসরি রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠপোষনায়। শেখ মুজিব তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেননানাভাবে, একদলীয় শাসন প্রবর্তন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটিপদক্ষেপ। বস্তুত, বাকসাল-ভীতি শিক্ষিত- অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের অনেকেই বিহ্বল করেছিল। তাসত্ত্বেও দেশবাসীর কাছে মুজিবের আবেদন তখনো কতটা প্রবল ছিল, খোন্দকারমোশতাক তা ভালো করেই জানতেন। সে জন্যে গদিতে বসেই তিনিভারত-বিরোধী ইসলামি ও আওয়ামী লীগ-বিরোধী যত রকমের মনোভাব ছিল,সেগুলো যদ্দুর সম্ভব কাজে লাগাতে চাইলেন। জাতির উদ্দেশ্যে তাঁরপ্রথম টেলিভিশনে ভাষণ মোশতাফ শু করলেন সজোরে বিসমিল্লাহ্ বলে,মুসলমানরা অনেকে কোনো কাজ শু করার আগে বিসমিল্লাহ্ বলেন। সুতরাং এতেকোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সশব্দে বিসমিল্লাহ্ বলে মোশতাক ইসলামী প্রতিকব্যবহারের নতুন নজির রাখলেন। রাতারাতি বাংলাদেশ বেতার রেডিওবাংলাদেশে পরিণত হলো, কারণ তা হলে সেটাকে শুনতে অনেকটা রেডিও পাকিস্তানের মত হবে, তাঁর ভাড়াটে এক সেনাপতি জাতীয় সঙ্গিত এবং জাতীয়পতাকা পরিবর্তনেরও জোর চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করল। মোট কথা ,স্বাধীন হবার পরে এই একটি সরকার প্রথমে সরাসরি রাষ্ট্রীয়পৃষ্টপোষনায় ধর্মনিরপেক্ষতার বারোটা বাজানোর চেষ্টা শুকরলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্র থেকে ইসলামীকরণেরপ্রতি অনুকুল সাড়াও পেয়েছিলেন।বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তে - ১৯৭১ সালে- চীন এবং সৌদী আরব বাংলাদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।(চীনের প্রথম ভিটো বাংল াদেশের বিদ্ধে) । খোদপাকিস্তান বাংলাদেশকে মেনে নেবার পরেও এই দু'টি দেশ বাংলাদেশকেস্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু খে ান্দকার মোশতাক বিসমিল্লাহ্ বলার সঙ্গেই অলৌকিভাবে এই দু'দেশেরস্বীকৃতি এসে গেল। সুযোগ পেলে তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য আর কী কীভোজবাজি দেখাতেন , সেটা এখন কেবল অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতার খেলায় তিনি ডিগবাজি খেলেন। গদি থেকেতাঁর সরে যেতে হল।

রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠপোষনায় ইসলামের তথা সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটানোর নীতিরশ্রীবৃদ্ধি ঘটান মুক্তি যুদ্ধের বীর সৈনিক- কিন্তু ক্ষমতালোভী --জিয়াউর রহমান। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেমাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তিডাবল মার্চ করে ইসলামী পরিচয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষমতায় বসারঅল্প দিন পরেই জিয়া বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয়ের নাম পরিবর্তন করেবাঙালির বদলে বাংলাদেশী করেন। অথচ বাঙালি পরিচয়কে কেন্দ্র করেই ১৯৭১সালের স্বাধীনতার লড়াই হয়েছিল। এবংএ পরিচয় নিয়ে বাঙালিদের গর্বের সীমা ছিল ন া। কেবল তাই নয়, ১৯৭৭ সালেরশুতে জিয়া রাষ্ট্রপতির ফরমান জারি করে বাংলাদেশের সংবিধানেরবড় রকমের

পরিবর্তন করেন। এরমধ্যে একটি হল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি কলমেরএক খোঁচায় বদলে গিয়ে আল্লাহ্‌কে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে যান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ স্বীকৃতি না পেলে আল্লাহ্‌যেন ঠিক অ াপন মহিমায় থাকতে পারছিলেন না।

কেবল সংবিধানের পরিবর্তন নয় ,বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে পাল্টে দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদীজে াশে ইসলামী মশলা দেবার জন্য তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় আমদানিকরলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। মুজিবের আমলেও কেউ পূব বাংলা আর পশ্চিমবাংলার মিলন ঘটিয়ে এক অখন্ড বঙ্গ গড়ে তোলার দাবি জানান নি। তখনওধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলমান -প্রধানবাংলাদেশের ধারণাটাই বদ্ধমূল ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর জিয়ার বাংলাদেশীজাতীয়তাবাদে পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু জিয়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণটিকেচোখা করে তুললেন তা দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক (তথাকথিতভারতপন্থী) শিক্ষিত সম্প্রদ ায়কে বিঁধে ফেলার জন্য। শাহ আজিজথেকে আরম্ভ করে আওয়ামী লীগের দলছুট অনেক দালালকেই তিনি খুব সহজে তাঁর ধারালো ইসলামী বড়শি দিয়ে গেঁথে ফেললেন। এই ইসলামীদৃষ্টিকোণটা তাঁর বাংলাদেশী পরিচয়কে এত সাম্প্রদ ায়িক চেহারাদিয়েছিল যে, তাঁর প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ সংসদে একদিন বলেই ফেললেনঃ তাঁদের ভাষার নাম হলবাংল াদেশী ভাষা। এ থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিজেদের পরিচয়কেসযত্নে একেবারে আলাদা করে দেখানোই ছিল জিয়ার আসল উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনিদেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর এবং আর্ন্তজাতিক একটি বড় জোটের অন্ধ সমর্থন আশা করতে পারতেন।আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও জিয়া যে-কৌশল নিয়েছিলেন তা ছিল ইসলামী দেশগুলো , বিশেষ করে সৌদী আরব আর পাকিস্তান , এবংচীনের প্রতি আনুগত্য এবং ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবৈরী মনোভাব দেখানোর। তিনি প্রায় উপযাচক হয়ে যেভাবে ইসলামীসংহতি জোটে গিয়ে তরবারি ঘোরাতে থাকেন, তাও ব াংলাদেশের ভাবমুর্তিকেবদলে দিতে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চতুর ব্যাক্তি। তাঁরইসলামী লেবাস দিয়ে তিনি তাঁর ফৌজি উর্দিকেও ঢেকে ফেলতে পেরেছিলেন।তাঁর সব দোষ ঐ এক জিগিরে চাপা পড়েছিল।এবং এর ফলে , যত দিন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পেছন থেকে ছোরা না মেরেছেন,তত দিন তিনি ভালোভাবেই ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। কিন্তু তার দ ামদিয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

মোট কথা, জিয়াউর রহমানধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে পরিজন ফেলে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েমুক্তিযুদ্ধ করলেও, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রথম সুযোগেই তিনিআল্লাহকে তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সাহেবের ক্ষমতায় টিকে থাকারজন্যে ইসলামী কার্ডের দরকার ছিল আরও বেশি। কারণ তাঁর মধ্যে না ছিল শেখমুজিবের ক্যারিসমা, না-ছিল জিয়ার মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়। বস্তুত, তাঁর মতোন্যূনতম জনসমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের গদিতে কেউ বসেননি। সে জন্যেই , তিনিপিরেরকাছে ধর্ণা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের আত্ম ার মাগফেরাত কামনা করেমিলাদের আয়োজন পর্যন্ত অনেক রঙ্গ দেখান। ব্যাক্তিজীবনে এরশাদ খুব ধার্মিকছিলেন, তাঁর এমন সাক্ষী কমই পাওয়া যাবে । মনে হয় না, ইসলামেরপ্রতি তাঁর খুব মহববত ছিল। যতদিন তিনি আওয়ামী লীগ এবং বি এন পি-রনেত্রীদের আলাদা করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, ততদিন তিনি কেবল জিয়ারইসলামী এবং বাংলাদেশী জ াতীয়তাবাদেরনিশান উড়িয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ দু'দল যখন এক দফা আন্দোলনআরম্ভ করল , অর্থৎ এরশাদ -বিরে াধী আন্দোলনে এককাট্টা হল, তখন এরশাদ বিপদেরগন্ধ পেলেন। তাঁর বিদ্ধে গণ-আন্দোলনজোরদার হবার মুখে তিনি ত াইতুরুপের তাস হিশেবে সংবিধানের আর এক দফা পরিবর্তন করলেন ১৯৮৮ সালের৭ই জুন। মেজর জেনারেল জিয়া আল্লাহকেসর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। লেফটেনেন্ট জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশকে রীতিমতোইসলামী দেশেরমর্যাদা দ ান করলেন। তাতে করে তাঁর ভরাডুবি রক্ষা না পেলেও, ধর্মনিরপেক্ষতাএবং অসাম্প্রদায়িকতার যা ক্ষতি হবার নিশ্চিন্ত ভাবেই তা হল।

বস্তুত, শেখ মুজিবের পতনের পর,সেনাবাহিনীর যে-অধস্তন বীরপূঙ্গবরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন, টিঁকেথাকার উদ্দেশ্যেই তাঁদের মুজিব-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী জনগোষ্ঠিরসমর্থন পাওয়া দরকার ছিল। এবং সেটা তাঁরা এবং তঁ াদের পরে জিয়াউররহমান ইসলামের ধুয়ো তুলেই করেছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় আসেন এরকয়েক বছর পর। মার্কাস ফ্র্যান্ডো -র মতে, সামান্যতম জনসমর্থন নিয়ে।স্বভাবতই, কবিতার আড়ালে , তাঁরও ভারতবিরোধী এবং ইসলামপন্থীস্লোগ

ান সকাল সন্ধ্যেয় জপ করতে হয়েছিল। সত্যি সত্যি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শেখ মুজিবের পরবর্তী সরকারগুলো ইসলামের যেচরম ব্যবহার করেন, তা ভন্ডামির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এর ফলেইসলাম ধর্মের কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল,আমার সঠিক জানা নেই, কিন্তু দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ আবারফিরে এসেছিল। লাখ লাখ লোকের প্রাণ এবং লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতেরবিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েও বাংলাদেশে কখনো জনগণের দ্বারা , জনগনের জন্যে সরকার গঠিত হয়নি। (১৯৯০ এরনির্বাচনই ছিল একমাত্র ব্যাতিক্রম। তবে নির্বাচ নে শেষ পর্যন্ত সরকারেরকাজকর্ম এক পথে যাবে, এমন গ্যারান্টি কে দেবে?) পাকিস্তানী ঐতিহ্য ধরেই সেখানেআধা-সামরিক কাজকর্ম আধা-সামরিক, আধা-বেসামরিক একটি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রতৈরি হয়েছে। জনগণ যে - সরকারেরপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেননি, অথবা অংশগ্রহণ করতেপারেননি, সে জন্যে সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার উদ্দেশ্যেই একের পরএক সরকারগুলোকে কোনো না কোনোধুয়ো তুলে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে রাখতে হয়েছে। কখনো খাল খনন,কখনো বিদেশী ফুটবল - ক্রিকেট দল এনে হৈ চৈ , কখনো বা তণদেরদৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখারউদ্দেশ্যে যুব মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা - এ ধরণের কয়েকটিদৃষ্টান্ত।

কিন্তু যা সবচেয়ে সহজ ব্যাপকজনগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থহয়েছে তা ইসলামের ডুগডুগি। এব্যাপারে সরকারের দুটো সুবিধাও ছিল।অন্যান্য কাজে পুরোটা টাকা দিতে হয় সরকারকে। কিন্তু এ কাজে নানা পথেপেট্রো-ডলারের আর্শীবাদও পাওয়া যাচ্ছিল এন্তার। তা ছাড়া, ধর্মেরএকটা নেশা আছে, যা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতোই যত সেবন করা যায়, ততই বাড়ে, ধর্মীয়কাজে ব্যয় করার জ্যন্যদেশের মধ্যেও লোকের কোনো অভাব হচ্ছিল না। আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যযে-লোক দুই প্রস্থ হিশেবের খাতা রাখে, সেই হয়তো বেবেস্তেএকটা বার্থ রিজার্ভ করার জন্য একটা মসজিদ করে দিয়েছে, অথবা নিদেনপক্ষে একটা মাদ্রাসা। এভাবেইবাংলাদেশের বিরাট একটা জনগোষ্ঠী ধর্মের পথে প্রায় উল্কার গতিতে এগিয়ে গেছেন। তবে কোন্আসমানের দিকে তাঁরা যাবেন, কলকাঠি নেড়ে তাঁদের সেই দিক নির্দেশকরেছেন অংশত সেই রাজনীতিকরা, ধর্মের নাম ব্যবহার করে যাঁরারাতারাতি ক্ষমতা লাভের খোয়াব দেখেছেন; আর সেইধর্মব্যবসায়ীরা, সৌদি আরব, লিবিয়া, ইরান এবং ইরাকের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিনাযাঁরা লাভ করেছেন।

ইসলামীকরণের যে-প্রক্রিয়াস্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পরেই শু হয়েছিল, তার ফলে সবচেয়েক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দুটি গোষ্ঠী- অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা আরসংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন মুসলমান , কারণ জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুসলমান।কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানরাও এ যুদ্ধে সমান উৎসাহেই যোগ দিয়েছিলেন, প্রাণের সমান ঝুঁকি নিয়ে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মনোবল ভেঙে দিয়েছে সবচেয়েসংখ্যালঘুদের। পাকিস্তানের আমলে তাঁরা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকছিলেনই, যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে তাঁরা রক্ত এবং প্রাণদিয়েছিলেন, তাঁদের সেই সাধের বাংলাদেশেও তাঁরা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীরনাগরিকে পরিণত হলেন। তাঁরা না-পারলেন নিজেদের সত্যিকার বাংলাদেশীহিশেবে সনাক্ত করতে, না তাদের চারিদিকের বিপুল জনগোষ্ঠী তাঁদেরমেনে নিতে পারলেন নিজেদের দেশপ্রেমিক ভাই বলে। এই আশাভঙ্গ এবংবিশ্বাসঘাতকতায় অনেক কিছুই ভুমিকা পালন করেছে, কিন্তু রাজনীতিকদের.ক্ষমতা-লোভ সবচেয়ে বেশী দায়ী। দেশে যে কোনো জনগনের সরকার তৈরীহল না, কোনো সরকারই যে কেবল সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভর করেথাকতে পারল না,এবং ক্ষমতায় যার প্রয়াসের ব্যয় হল , সে না-পারলদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে, না-পারল ধর্ম পালনের কাজটাকে সাধারণমানুষের হাতে ছেড়ে দিতে। ক্ষমতায় থাকার অন্যতম প্রধানহাতিয়ার হিশেবেই তার মরণাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মের আফিমও ব্যবহৃত হতে থাকল সরকারীপৃষ্ঠপোষনায়। এমন ধর্মবিরোধী কাজ সাধারণ চোর-ডাকাত -খুনীরআয়ত্তের একেবারে বাইরে সত্যি বলতে কী, তারা এটা ভাবতেও পারে না।

৪

ধর্মের প্রতি এই উৎসাহএমনিতে মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু তার উল্টো পিঠে আছে অন্যসম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। সেটাই পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে।ধর্মের উদারতাকে নয়, ধর্মের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকেই এ ক্ষেত্রেব্যবহার করা হয়েছে। যে বস্তু রোগ সারায়, তাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিষাক্তহয়ে ওঠে।

ধর্মের নাম করে রাজনৈতিক ফয়দা লোটার সরকারী ভন্ডামীর স্বরূপসরল জনগন সামান্যই বুঝতে পেরেছেন।

তাঁরা বরং দিনরাত্তির সরকারীপ্রচারযন্ত্রে ইসলামী অর্কেষ্ট্রা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেতনভুক মওলানাদের ওয়াজ শুনে শুনে ত্রমবর্দ্ধমান মাত্রায় কেবলার দিকেই ঝুঁকেপড়েছেন। যে-অর্থনৈতিক সংকট এবং জানমালের নিরাপত্তার অভাবের মধ্যেতাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন , তাতে ইহলোকের সমস্যা সমাধানে পরলোকেরদাওয়াই থেকে তাঁরা ভালোই ফল পা চ্ছিলেন। মনের সান্ত্বনাই তো মানুষকেসুখী অথবা দুঃখী করে।

মোট কথা, ১৯৫২ সালে ভাষাআন্দোলনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেএবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষনএবং দুঃশাসনের মুখে ইসলামীসাম্রাজ্যবাদকে কদলী দেখিয়ে বাংলাদেশের মতো একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের উদ্ভব হয়েছিল, মুজিবের পতনের এক দশকের মধ্যে তা বলতে গেলেপুরোপুরি লোপ পেয়েছিল। যা বাকি থাকল, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয়সঙ্গিত ভিন্ন হলেও, তার নাম পাকিস্তান হলেও ক্ষতি ছিল না।

পেছনে ফিরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সালপর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই চোখেপড়ে বাঙালি মুসলমানরা ১৯৪০-র দশকে কীভাবে নিজেদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় বলেগণ্য করেছিলেন। তারপর, ভাষা আন্দোলনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীপ্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে তাঁরা ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়েও নিদেদের ভাষিকপরিচয়কেইবড় করে তুলছিলেন। এই পরিচয়কে বড় করতে গিয়েইতাঁদের সাময়িকভাবে সাম্প্রদা য়িক মনোভাবকে চাপা দিতে হয়েছিল। যুদ্ধেরঠিক আগে অথবা যুদ্ধের সময়ে মনে হয়েছিল হয়তো এই বাঙালি পরিচয়স্থ ায়ী মর্যাদা পাবে এবং দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় অন্তত ধর্মের নামে একে অন্যের মাথাফাটাবে না, কিন্তু ভারতের মৌলবাদী জঙ্গী হিন্দুরা অযোধ্যার মসজিদ ভাঙায়বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানরা তাঁদের বাড়ির পাশের নির্দোষ হিন্দুদেরপ্রতি একেবারে যে আচরণ করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, ১৯৬০ এরদশকে আমরা যেটুকু অসাম্প্রদায়িকতা অর্জন করেছিলাম, তা অনেক আগেই ধুয়ে ফেলেছি।

আমরা এগিয়েছি না পেছিয়েছি , তাবোঝার জন্যে একটা তুলনাই এখানে যথেষ্ট। ১৯৪৬ সালে অনুরূপ এক ঘটনায়-কাশ্মীরে হজরতের চুল খোয়া যাওয়ায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদেরবিদ্ধে দাঙ্গা হয়েছিল। এবং সরক ার নিষ্য়ি থেকে সে দাঙ্গা হবার সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই দাঙ্গার প্রতি শিক্ষিত লোকদের ঘৃণা ছিলসর্বস ম্মত । আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো লোক তখন আপন প্রাণদিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর একেবারে কাছে এসেযখন দাঙ্গা হল তখন খুব কম শিক্ষিতলোকই দাঙ্গার বিদ্ধে নির্ভেজাল ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অথবা এরপ্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন । বাবরি মসজিদ যারা ভেঙেছে, তাদের মধ্যে একদল ধর্মান্ধ, একদল আমাদের ধর্মব্যবহারকারী রাজনীতিকদের মাসতুতোভাই। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নয়, রাজনৈতিক মুনাফা লাভেরজন্যেই তারা ব াবরি মসজিদ ভেঙেছিল।কিন্তু বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিরপরাধ হিন্দু প্রতিবেশীর গায়ে হাত দেবার আগে এট ামোটেই বিবেচনা করেন নি যে, বাবরি মসজিদ অনেক পুরাণো হলেও , ১৯৪১ সালথেকে সে মসজিদ অব্যবহৃত। সে মসজিদে নিরাকার আল্লাহার উপাসনা হয়নি, বরং রামের মূর্তিই সেখানে স্থান পেয়ে এসেছে। এ সত্ত্বেও যে-মুসলমানরা শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগে দাঙ্গা করেছে, তাদের অপরাধওসম্ভবত লঘু করে দেখা যায়। কিন্তু যারা ভয় দেখিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীকেতাড়িয়ে দিয়ে তার সম্পত্তি অধিকার করার লোভে দাঙ্গা করেছে, তাদেরঅপরাধ একেবারে অমার্জনীয়।

বস্তুত, গত চার দশকেরসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, যুদ্ধের আগে পর্যন্তসাম্প্রদায়িক দাঙ্গ ায় ধর্মীয় আবেগ কাজ করত- হিন্দুদের পারলে মেরে ফেলাই ছিলদাঙ্গার প্রধান উদ্দেশ্য,। এখনকার দাঙ্গায় হিন্দুদের না মেরে তাদেরবাড়িঘর, দোকানপাট লুট করে তার পরে তাতে আগুন লাগানো এবং ভয়দেখিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করানো বোধ হয় প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ , তা হলে তাদের সম্পত্তি দখলকরার মওকা মেলে । সেদিক দিয়ে বিচার করলে , বর্তমান সাম্প্রদায়িকতাআগের তুলনায় অনেক বেশি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা এবংসুপরিকল্পিত। এটাকে আগেক ার প্রগতিশীলতা বিনষ্ট করা বললেযথেষ্ট হয় না, এটা সত্যিকারঅর্থেই উজান স্রোতে একেবারে উল্টোমুখে ছুটে চলা।

সাম্প্রদায়িকতা ঘরে ঘরেপ্রাত্যহিক জীবনে প্রসার লাভ করেছে নানা চেহারায়, নানা রঙে।এককালে পাকিস্তানী আমলে আমরা যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিদ্ধে একটা কথা বলে শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক সমর্থন, এমনকী , প্রশংস াপেতে পারতাম, এখনসে সম্ভাবনা সীমিত হয়ে এসেছে । কেবল একটি এলাকায় এখনোসাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্মান্ধতা নাক গলাতে পারে নি- সে আমাদের সাহিত্য।আল মাহমুদের মতো ব্যতিত্রমের কথা ভুলে যাচ্ছিনে। কিন্তু সাধারণ ধ

ারাটা মোটেই সে রকমের নয়। কিন্তুকারণটাকী? আমাদের সাহিত্যিকরা কি বাস্তব জীবন থেকে সরে গেছেন?নাকি, আম াদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার যে মহামারী লেগেছে, সেটাসাময়িক এবং এখনো সমাজের মর্মকে স্পর্শকরতে প ারেনি? ধরে নিচ্ছি, পরেরটা সত্যি। এবং যদি তাই হয়, তাহলে চারদিকের নীরন্ধ্র অন্ধকারে সেটাকেই একমাত্র আশার ক্ষীণ আলো বলে দেখতেপাচ্ছি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com